দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 APR 1989
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

17

9

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

দৈনিক ইনকিলাব

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর প্রসঙ্গে

মোঃ জহিরুল হক শামীম

জনসংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র এই বাংলাদেশ। অতএব স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল বহপূর্বে।

বাংলাদেশে মুসলিম রাজত্বকাল প্রায় ছয়শত (১১৯৭-১৭৯৭) বৎসর বর্তমান ছিল। এই সময়কালে মুসলিম শাসক ও ধর্মপ্রচারক দরবেশগণ এ দেশে ইসলামী শিক্ষার মূল বুনিয়াদ পত্তন করেন। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে বখতিয়ার খিলজীর শাসনামল হতে আলীবর্দী খাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার বিপুল প্রসার ঘটে। মসুলিম যুগের অবসান ঘটে বেনিয়া ইংরেজদের আগমনে। ১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে নাবাব সিরাজউদ্দৌলার পরজায় এবং এরও একশত বছর পর ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার মাধ্যমে সমগ্র ভারত উপমহাদেশ বৃটিশ শাসকদের করতলগত হয়।

বৃটিশ শাসকরা প্রথমই মুসলমানদেরকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ও ধর্মীয় তথা ইসলামী শিক্ষার দিক থেকে পঙ্গু ও সমুলে নিশ্চিহ্ন করার কাজে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

চতুর বৃটিশ শাসকরা প্রথমেই মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তনে মনোযোগ দেয়। উইলিয়ম হান্টার তার নিজ জবানীতে বলেন, "এ দেশ আমাদের অধিকারে আসার আগে তারা (মুসলমান) শুধু যে রাজনৈতিক নিয়ন্তা ছিল তা-ই নয়; চিন্তার ক্ষেত্রেও তারা ছিল প্রধান শক্তি। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মোটেই উপেক্ষণীয় ছিল না।"

মুসলমানদের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রভাব খর্ব এবং নির্মূল করার উদ্দেশে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে হান্টার সাহেব লিখেন "ইতিমধ্যে আমরা আমাদের নিজস্ব এক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেছি এবং যেই মাত্র এই নতুন ব্যবস্থায় যথেষ্ট নতুন লোক শিক্ষিত হয়েছে— তখনই আমরা পুরনো মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, আর মুসলমান যুবকদের সামনে কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।"

বৃটিশদের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল (H. Sharp-এর ভাষায়)) "তারা (ভারতীয়রা) হবে এমন এক শ্রেণীর যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচিতে, ভাবধারায়, নীতিতে, বক্তিতে ইংরেজ।"

মেকলে বৃটিশ শিক্ষা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, "We are with holding from them the learning for which they are craving, we are foveing on them the much—learning which they nauseate" "এরা (মুসলমানগণ) যা শিখার জন্য উদগ্রীব, তা থেকে তাদেরকে নিবৃত্ত করছি। আর যা তাদের ঘৃণার উদ্রেক করে তা বহুল পরিমাণে শিক্ষার জন্য বাধ্য করছি।"

উইলিয়াম হান্টার আরও বলেন, "বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষায় মুসলমানদের হৃদয়ের ৩টি প্রগাঢ় অনুভূতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে।

১. পার্সী ও আরবী ভাষার পরিবর্তে তদানীন্ত বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ ও এ কাজে হিন্দু শিক্ষক নিয়োগ।

২. মুসলমানদের জীবনের মর্যাদা ও স্বীয় ধর্মের চর্চা ও অনুশীলন সমৃদ্ধ ভাষা ও বিষয়বস্তু বঞ্চিত পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তন।

৩. মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থা উপেক্ষা করা।

ফলে বৃটিশ ভারতের শিক্ষা মুসলমানদের জাতীয় সত্তা ও স্বীকৃতির কবর রচনা করে যার অভিশাপ থেকে আজও এ উপমহাদেশের মুসলমানগণ মুক্তি পায়নি। মূলতঃ বৃটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা ভারত উপমহাদেশে শিক্ষা ক্ষেত্রে ত্রি-ধারার জন্ম দেয়ঃ

১. ইংরেজী মাধ্যম বিশিষ্ট দেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ধর্মনিরপেক্ষতা তথা এংলো খ্রীস্টান শংকর ঐতিহ্য।

২. খৃস্টান মিশনারীসমূহে খ্রীস্টাব্দ।

৩. কওমী মাদ্রাসাসমূহে রাজনীতি শূন্য ইসলামের অপূর্ণ আদর্শবাদ। বৃটিশ শাসকরা ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় শেষ আঘাতটি হানে ১৭৮০ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করে। অর্থাৎ বৃটিশ সরকারের যাবতীয় কলাকৌশল ব্যর্থ করে দিয়ে তখনও সারা ভারতবর্ষে অসংখ্য কওমী মাদ্রাসাসমূহ বৃটিশ সরকারের কোন সাহায্য বা অনুকম্পা ব্যতীত টিম টিম করে জ্বলছিল। আর এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাদের সন্তানদের পাঠাত। স্থানীয় ব্যক্তিদের চাঁদায় এসব শিক্ষা পৃতিষ্ঠান পরিচালিত হত। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামী শিক্ষার চেতনা ও উন্মেষ ঘটনোর ক্ষেত্রে মূলতঃ আমরাও এসব মকতব, কওমী ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসাগুলোর নিকট ঋণী। বৃটিশ সরকার এসব প্রতিষ্ঠানকে সরকারী সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে "হান্টার এডুকেশন কমিটির (১৮৮২)" সুপারিশ যে কোনভাবে ধর্মহীন শিক্ষার শর্ত জুড়ে দিয়েছিল।

ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের উপর বৃটিশ সরকারের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কিন্তু খুব বেশী দিন বৃটিশ সরকার এসব প্রুতিষ্ঠানকে উপেক্ষা করতে পারল না। কালক্রমে বৃটিশ সরকার যখন টের পেল, এসব প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে এবং তা বৃটিশ প্রভাবমুক্ত ইসলামী শিক্ষা তখন তারা মুলসমানদেরকে বাগে আনার জন্য নতুন কৌশলের আশ্রয় নিল। এরই ফলশ্রুতিতে কলকাতা মাদ্রাসা তথা মোহামেডান কলেজ স্থাপন করে সকল মাদ্রাসাকে এর আওতাভুক্ত করে। মাত্র তিন বছর পর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার নিজস্ব পাঠ্যসূচী বাদ দিয়ে ১৭৯০ সালে ইংরেজদের পছন্দমত এবং তাদের শিক্ষানীতির আলোকে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হয়। এভাবেই ইসলামী শিক্ষার সর্বশেষ ধারাটিও বৃটিশের চাতুর্যের জালে আটকা পড়ে।

মাদ্রাসা শিক্ষা যথা ইসলামী শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার নামে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষানীতির আলোকে পুনর্বিন্যাস করার বিষময় ফলের পরিণামে "ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন জীবন ব্যবস্থা"-র বদলে ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদের মধ্যে দুটো বিভেদ সৃষ্টি করে।

১। ইসলাম নিছক ধর্ম, এতে রাজনীতির স্থান নেই।

২। ইসলাম একটি সর্বাঙ্গীন জীবন বিধান নিছক ধর্ম নয় অর্থাৎ— complete code of life অন্য কথায় খৃষ্টান জগতের church ও Crown এর মতো দু'টি পৃথক সত্তার অনুপ্রবেশ ঘটেছে ইসলামী শিক্ষা দর্শনে।

আশা করি এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, বৃটিশ শাষকরা কেন এবং কি উদ্দেশে কোন্ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা এ দেশে প্রবর্তন করেছিলো।

তদানীন্তন বৃটিশ আমলের প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরাধিকার নিয়েই ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান আমলের যাবতীয় শিক্ষা কমিশনগুলোর রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মূলতঃ ইসলামী শিক্ষার সংস্কার করার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলা হয়নি। বরং বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাই একটু এদিক-ওদিক করে বহাল রাখা হয়েছে। একইভাবে বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার উত্তরাধিকার পাকিস্তানের পথ বেয়ে ১০৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরও বহাল রয়েছে।

অথচ বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। এ দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোক মুসলমান। সে হিসেবে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী হওয়াই স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয়নি। বরং ইসলামের ছিটে ফোটা এ পর্যন্ত জন জীবনে যতটুকু বেঁচে রয়েছে তাও ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে।

এর অন্যতম কারণ শিক্ষা ব্যবস্থা। যে কোন জাতি তার স্বীয় আর্দশ, স্বকীয়তা বিকাশ ও প্রসার শিক্ষার মাধ্যমেই করে থাকে। এ দৃষ্টিতে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষার বিষয়বস্তু বাংলাদেশী তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা, আদর্শ-ঐতিহ্য ও আশা আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে রচিত হয়নি।

ফলে যে শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি জাতি সুসংহত ও শক্তিশালী হয়, সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই আমাদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতির জন্য হয়ে উঠল আত্মঘাতী। একই দেশে বর্তমানে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান। (১) ইংলিশ বা মিশনারী স্কুল। (২) বাংলা মাধ্যম সাধারণ স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও (৩) মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। ফলে, এই শিক্ষা ব্যবস্থা একই দেশের ছাত্র সমাজকে কখনও বিপরীতমুখী, কখনও বা সংঘর্ষমুখী করে তুলেছে। এদের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবন বোধ বিভক্ত করে ফেলেছে।

ফলে এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরী হচ্ছে "মিষ্টার" এবং অন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরী হচ্ছে "মোল্লা"।

অথচ এ দেশের বৃটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে ইসলামী মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত করার দাবী এ দেশবাসীর বহু কালের প্রাণের দাবী।

১৯১৪ সালে মোহামেডান এডুকেশন সোসাইটি ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তদানীন্তন বাংলার সরকারের নিকট সুপারিশ করেন। "মাওলা বক্স কমিটি" (১৯৩৮-৪১) "ইউনিভার্সিটি অব ইসলামিক লার্নিং" স্থাপনের প্রস্তাব করেন।

তদানীন্তন যুক্তবাংলার প্রধানমন্ত্রী এ, কে, ফজলুল হক "আরবী বিশ্ববিদ্যালয়" স্থাপনের অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন। মুয়াজ্জদিনের "মাদ্রাসা সিলেবাস কমিটি" (১৯৪৯-৫১) মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ পেশ করেন।

"ইষ্ট বেঙ্গল এডুকেশনাল সিস্টেম রিকনস্ট্রাকশন কমিটি (১৯৪৯-৫১)-র সভাপতি আকরাম খাঁ পুনরায় ইউনিভার্সিটি অব লার্নিং" স্থাপনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৬৩-৬৪ সালে "ইসলামিক এরাবিক ইউনিভার্সিটি কমিশন" ও অনুরূপ প্রস্তাব করেন।

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী তার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপন উপমহাদেশে ইসলামী শিক্ষার সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ আরবী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর পর্যন্ত স্থাপন করেন চট্টগ্রমের 'দিয়া' পাহাড়ের পাদদেশে। এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন উপমহাদেশের অন্যতম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীও।

আর এ সকল ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের সকলেরই স্বপ্ন ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় হবে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে প্রাচ্য আর পাশ্চ্যাতের জ্ঞান-বিজ্ঞান মিলেমিশে একাকার হয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতার দেয়াল ডিঙ্গিয়ে অনন্ত জ্ঞনালোকের সন্ধানে যাত্রা শুরু করবে। অবশেষে বহু অকার্যকারিতার পথ পেরিয়ে এই উপমহাদেশের জ্ঞানী-মনীষীদের স্বপ্ন কোটি কোটি মুসলমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আন্দোলনের প্রতীক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ ২৩০ বছর পর ১৯৭৬ সালের পহেলা ডিসেম্বর সরকারীভাবে স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করে। একটি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

চলবে